বহুরূপীর ছেঁড়া তার। কলকাতার ভাবনার ভুবনে নতুন ঠিকানা

পঞ্চাশের ক্যাটালগ

সুপ্রিয় সেন

(লেখক)

চোখের দেখাটা কোনও দেখাই নয় যদিনা দেখারচোখ থাকে। পঞ্চাশের দশকেরকলকাতা নিত্য অষ্টপ্রহর চোখে দেখেছিলাম বটে কিন্তু সে তো কযেকটা ফটোগ্রাফ মাত্র। তাও অনেকটা 'ডুইং ইন্ডিয়া'র মতো গড়পড়তা বিদেশী ট্যুরিস্ট যেসব প্রাণহীন ছবি তোলে প্রায় তারই সমগোত্রের। সে ছবিতে তাজমহল থাকে সে কেবল বিভিন্ন এ্যাঙ্গেলে তোলা পোস্টকার্ড ছবি। একদা এক আসন্ন রাত্রি তৃতীয়া তিথিতে '৫৩ সালে যে সম্পূর্ণ নির্জন তাজের রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম চার বন্ধুতে, সে রহস্যের স্বাদ কোথায় থাকে পর্যটকের তোলা কোন ছবিতে! শুভ্রকেশ ও আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু বিজ্জসিত সাদা জোব্বা পরা এক বৃদ্ধ মুসলমান হাতে একটি কাঁচ ভাঙা লম্ফ নিয়ে আমাদের দেখিয়েছিলেন কয়েকটি সিঁড়ি নেমেই তাজের গর্ভগৃহে মমতাজ বেগম আর সাহাজাহানের আসল সমাধি। তারপরে আমরা বসে থেকেছিলাম যমুনার দিকে শ্বেত মর্মর চাতালে। আকাশে তৃতীয়ার চাঁদ ছিল, অস্পষ্ট জোছনা- আর ছিল শিরশিরে প্রথম শীতের ঈষৎ শীতল হাওয়া। আধঘণ্টা আমরা, সেই নবাসাদ্বিত যৌবনের চপল দিনে চারবন্ধু একটি শব্দও উচ্চারণ করিনি। শুধু যমুনার মৃদুতম কলধ্বনি ছাড়া আরকোন শব্দই ছাড়পত্র পায়নি তাজের প্রাঙ্গণে এসে ঘুমন্ত রাজদম্পতিকে বিরক্ত করার। যার অলিখিত, অনুচ্চারিত নির্দেশে সে স্পর্ধা আমরাও দেখাতে সাহস পাইনি।

সেই হচ্ছে দেখা। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা। দিনের আলোয় যতবার যে তাজমহলকে কোনদিন সে দেখা দেখতে পাইনি পঞ্চাশের দশকে কোলকাতার বহিরঙ্গকে দেখেছিলাম বটে কিন্তু তার সেই অন্তর্নিহিত স্পন্দন অনুভব করেছিলাম কি? আঠারো বছরের রাডার সেই পরিণত প্রযুক্তি কোথায়ই বা পাবে?

মনে মনে কখনও কখনও সন্দেহ হয়, সত্যি কি কোলকাতা তেমনটি ছিলো ভোরবেলা উঠে বিদ্যাসাগর হোস্টেল থেকে সে, রাতে ট্রাম ধরে যখন ময়দানে যেতাম এন. সি. সি.-র প্যারেডে তখন কর্পোরেশনের ওড়িয়া কর্মীরা এক অলৌকিক দক্ষতায় হোস পাইপের জল দিয়ে সব বড় রাস্তা ধুইয়ে দিতো। উল্টোদিকের ফুটপাথ থেকে শুধু রাস্তা নয় ধুয়ে দিচ্ছে এদিকে ফুটপাথও। জলের তোড় আগুন নেভানোর দমকলের মতনই তীব্র। অথচ আমরা যখন হেঁটে যাই সেই জলের একটি বিন্দুও আমাদের গায়ের জামা স্পর্শ করেনি। যদিও আমরা পেরিয়ে যাওয়ার পর মুহূর্তেই সেই চরণচিহ্ন ধুয়ে গেছে গঙ্গাজলে। ফাঁকা ট্রামের ফার্স্ট, সেকেন্ড দুটি শ্রেণিতেই দুচারটি লোক। কেউকেউ ভোরের হাওয়ায় তার ঘুমের আমেজটুকু ধরে রেখেছে। ট্রামের ঘণ্টাও যেন আর সেই অতীন্দ্রিয় সুরে আজ বাজে না। সুষুপ্ত নগরের নৈশব্দে বহুদূর থেকে দূরাগত ট্রামের সোঁ সোঁ আওয়াজ বেজে উঠত তারে তারে। সে আওয়াজ ক্রমশ জোর হত, ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম এসে দাঁড়াতো সামনে। উর্দি পড়া ফিটফাট কন্ডাকটার তার বুকে ঝোলানো মেশিনে ঢুকিয়ে খট করে টিকিট পাঞ্চ করে হাত বাড়িয়ে দিত।

আজকের এই ঘর্মাক্ত ভিড়ের বাস্তবে একথা বিশ্বাস করা কঠিন হবে যে তখন লোকে শুধু বেড়াবার জন্যও ট্রামে বাসে উঠতো। ছেলেবেলার মফঃস্বলির 'আমি'র কাছে কোলকাতার তিনটি চৌম্বক আকর্ষণ ছিল। হ্যাপি বয় আইসক্রীম, চিড়িয়াখানা, আর ট্রাম। গালিফ স্ট্রীট থেকে লোয়ার সারকুলার রোড ধরে যাওয়া পুরোনো ধরণের ট্রামগুলো ছিল কুদর্শন। একেবারেই নাপছন্দ। কিন্তু কর্ণওয়ালিশ ধরে যাওয়া বা বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জের ট্রাম ছিল দারুণ স্মার্ট, যেমন ঝকঝকে তেমনি আলোকদীপ্ত। বসবার সিটগুলি ছিল চির নতুন, কোথাও কোন ধূলিধূসরতা ছিল না। শ্যামবাজার থেকে লেক যাওয়ার ২এ, বাসের কিছু ছিল তখনকার ছাদহীন ডবল ডেকার, পেঁচানো ছিল তার দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। বৃষ্টি বাদলার দিন বাদ দিয়ে সেই দোতলা শীর্ষ থেকে মহানগরের প্যানোরামিক ভিউ দেখতে দেখতে এবং নির্মল হাওয়া খেতে খেতে সেই যাত্রা ছিল অতীব সুখপ্রদ, তখন পলিউশন কথাটা কোন ডিকসেনারিতেই ছিল না। ইট আর কংক্রিটের দৌরাত্ম্য ছিল না কিন্তু মনোরম সব ইমারত ছিল। কোলকাতাকে বলা হয় সিটি অফ প্যালেস। বাস চালাতেন পাঞ্জাবীরা। আর কনডাক্টরও ছিলেন সব পঞ্চনদের তীরে বেনী পাকানো শিখ সম্প্রদায়ের বিশালকায় মানুষেরা।

তারা ডালহৌসি এলে চেঁচিয়ে বলতেন লাউসি, লাউসি এবং ঢাকুরিয়াকে বলতেন ডাকরিয়া। শিয়ালদাকে শিয়াল্লা। বাঘের মুখ আঁকা স্টেট বাসতো এলো পঞ্চাশ একান্ন সালে, তাও ৮বি জাতীয় দু-একটি মাত্র রুটে।

ট্যাক্সিগুলিও তখন তার চালকদের মতই ছিল অতীকায়। পন্টিয়াক, ফোর্ড, শেভ্রলে আর স্টুডি বেকার - যার সামনেটা এবং পেছন দিকটাও লম্বায় ছিল প্রায় সমান। যা দেখে এক ঢাকার বাঙাল জিজ্ঞেস করেছিল 'গাড়ি খান আহে না যায়'। তার মিটার ছিল কিন্তু তঞ্চকতা ছিল না। যদিওবা কেউ বেশী ভাড়া দাবী করতেন, করতেন না কেউই, কিন্তু করলে সেই কৃপানধারীদের সঙ্গে ঝগড়া করার মত বুকের পাটা কারও ছিল বলে শুনিনি। সে তো এখনকার মত ছাব্বিশ ইঞ্চি বুকের বিহারী বা বাঙালী ড্রাইভার নয়।

আর ছিল ব্যতিক্রমীভাবে বিহারীদের দ্বারা চালিত টানা রিক্সা। রাত যখন আসতো ঘনিয়ে, কুলপি আর বেলফুলের ডাকও ফুরিয়েছে তখন গলির শেষ প্রান্ত থেকে শোনা যেত - দুরাগত নূপুর নিক্কণের মতন টানা রিক্সার ঘণ্টায় টুংটুংশব্দ। সেই আওয়াজে কেমন একটা ঘরোয়া আত্মীয়তার সুর ছিল। এখনকার যানবাহনের শব্দে কেবল উগ্রতা সে যেন ধমকে পথচারীকে হুমকি দিচ্ছে। সেই ঘণ্টার মৃদু সুভদ্র বিনয় চিরদিনের মত মিলিয়ে গেছে শব্দদানবের তাণ্ডবে।

তখন কোলকাতার আকাশটা মাটির অনেক কাছাকাছি ছিল। উত্তর কলকাতার সাবেকি গলির কথা বলছি না। সদর রাস্তা দিয়ে ট্রামে বাসে যেতে যেতে জানালা দিয়ে ডাইনে বায়ে তাকালেই দুধারের বাড়িগুলির মাথা ছাড়িয়ে কখনও নীল কখনও কালো মেঘ ঘনিয়ে আসা গম্ভীর আকাশ বা ফুলকপির মত সাদা মেঘের ভেসে যাওয়া দেখা যেত বিভিন্ন ঋতুতে। তখনও কোলকাতায় কংক্রিটের স্পর্ধা আকাশছোঁয়া হয়নি। বিশ্বাস করানো শক্ত যে পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কেমিক্যাল বিল্ডিং এর চারতলার একটি নির্দিষ্ট কোন থেকে হাওড়া ব্রিজের চূড়া দেখা যেত। ভেবে দেখুন যাদবপুর মানেই ১৬-১৭ কিলোমিটার দুরত্বতো বটেই।

যাদবপুরের কথা যখন উঠলোই - সেই ৫১ সালেও ওদিককার উদ্বাস্তু কলোনীগুলি তখন সবে গড়ে উঠছে। এখন যেখানে ৮বি বাসের টার্মিনাস, তখন সেই গোটা চত্বরটা শুধু দুটি মাত্র স্টেশনারি দোকান ছিল - যার পাশে একসঙ্গে বড়জোর দুটি একতলা স্টেট বাস দাঁড়িয়ে থাকতো। স্টেশন রোডের পাশে অবশ্য অনেক দোকান ছিল। যক্ষা হাসপাতালের গেটের দুইধারে। রাজা সুবোধ মল্লিক রাস্তার পশ্চিম দিকটায় অর্থাৎ যাদবপুর কলেজ ক্যাম্পাসের উল্টোদিকে আর সব খাখা মাঠ, ভেতরদিকটায় বেঙ্গল ল্যাম্পের কারখানা ছিল - তাছাড়া আর কোন ইমারতই ছিল না। চোখের সামনে পর পর গড়ে উঠলো গ্লাস এন্ড সিরামিক রিসার্চ সেন্টার, যাদবপুর পলিটেকনিক,

বিসর্জনে অমর গাঙ্গুলী ও শম্ভু মিত্র

স্কুল অফ প্রিন্টিং টেকনোলজি, কালটিবেশন অফ সায়েন্স, ন্যাশানাল ইন্সট্রুমেন্টস্। তারপরতো ৫৬, ৫৭-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হোল। তৈরী হল বিশাল ক্যাম্পাস। ঠিক এভাবেই শহরতলিতে যখন দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে, সমান্তরালভাবে ৫০, ৫১ এর হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার তখন জমির দখল নিচ্ছে এই গোটা দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে। যাদবপুর, রামগড়, বিজগড়, বাঘাযতীন, বিদ্যাসাগর, নেতাজী নগর, শ্রী কলোনী দ্রুত ভরে উঠছিল পূর্ব বাঙলার মানুষে। প্রায় নিত্যই লেগে থাকতো জমি দখলে রাখার লড়াই। জমিদারদের পাঠানো লেঠেল আর গুন্ডাবাহিনীর সঙ্গে প্রায় সর্বস্ব ফেলে আসা মানুষগুলির সঙ্ঘবদ্ধ সংঘর্ষ। ৫০-৫১তে হামেশাই যাদবপুরের ছাত্ররা দল বেঁধে এই হাঙ্গামার সময় উদ্বাস্তুদের সাহায্যে ছুটে যেত। কলোনীগুলির নামকরণও হয়েছিল তখনই। তার আগে ঐসব অঞ্চলের সেভাবে আলাদা কোন পরিচিতি ছিল না। গড়িয়ার এদিকটাই বলা হত।

৮০ এবং ৮০/এ, নম্বরের একখানাই রুটের বাস প্রায় একঘণ্টা পরপর চলাচল করত বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে যাদবপুর। আর একটি যেত টালিগঞ্জ ট্রামডিপো। তখন কাটাগঙ্গার খাল বা টালির নালা ছিল রীতিমতন নাব্য। দূরদূরান্ত এমনকি পূব বাংলা থেকেও বড়বড় নৌকা বোঝাই ধান, পাট, হাঁড়িকুড়ি ও অন্যান্য পসরা নিয়ে আসত ব্যবসায়ীরা। নাকতলার রাস্তার দুধারে ছিল হোগলাবন আর ধানক্ষেত। ষাটেব দশকেও আদি গঙ্গার তীরে তীরে শেয়ালদের বসতি ছিল ভালোই। প্রহরে প্রহরে নাকতলায় শেয়াল ডাকতো।

বস্তুতঃ পশ্চিমে গঙ্গা আর পূবের জলাভূমির জন্যে উপায় ছিল না, আর উত্তরে। আগে থেকেই স্থান সংকুলান কম ছিল বলে প্রবল চাপে কলকাতা বেড়েছে তার পূব দক্ষিণ এবং দক্ষিণেই। সেটা পঞ্চাশ সাল থেকেই শুরু। বছর দশেকের মধ্যে মোটামুটি

কলোনীগুলি থিতু হয়। অর্থনীতির কোন অজ্ঞাত কারণে নতুন অধিবাসীদের এই মহানগর, নিজের করে নিলেও বাজারে খুব একটা অভিঘাত কিছু একটা হয়নি। একেবারেই হয়নি তা নয়, খাদ্য আন্দোলন হওয়ার মতন পরিস্থিতি সাময়িকভাবে তৈরী হয়েছিল বৈকি। সেই আন্দোলন ক্রমশ জমাট বাঁধতে থাকে এবং বামপন্থা সেই সময়টাতেই ক্রমশ সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। বিশেষ করে ছাত্র সমাজে ব্যতিক্রমহীন ভাবে বামপন্থাই একমাত্র পন্থা হয়ে ওঠে।

পঞ্চাশের দশক ছিল হলিউডের স্বর্ণযুগ। আর তখন এসপ্ল্যানেড অঞ্চলের সিনেমাহলগুলি ছিল প্রায় স্বর্গপুরীর মত। মেট্রো, লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার ছিল রীতিমতো অভিজাত - পুরু গদিওয়ালা ঝকঝকে বসবার আসন, অতি আরামপ্রদ বাতানুকুল ব্যবস্থা - মেট্রোর- তো নিজস্ব একটা সুগন্ধ ছিল - ছিল দেওয়াল জুড়ে অসাধারণ সব ফ্রেসকো। লাইট হাউস আর নিউ এম্পায়ারের মধ্যে উপর তলায় যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল - আর ছিল বার। সাহেবি কেতা তখনও পুরো মাত্রায় বিদ্যমান। তা ছাড়া এলাইট ছিলো, কেউ কেউ বলতো এলিট, ছিলো গ্লোব আর মিনার্ভা যা এখন চ্যাপলিন। আর ছিল টাইগার, যেটি বংশে কুলিন নয় - তার চেয়ার ছিল কাঠের এবং টয়লেটে অশ্লীল সব হাতে আঁকা চিত্রকলা ও তার ভাষ্য। কী সব সিনেমা তখন আসতো হলিউড থেকে। আর কারা সব অভিনেতা, অভিনেত্রী! টিকিট কেটে অন্ধের মত যেকোন একটা হলে ঢুকলেই হয়। রোনাল্ড কোল্ডম্যান, পল যুবি, হামফ্রি বোগার্ট, লরেন্স অলিভেয়ার, জোস ফেরার, গ্রেগরি পেক বা মার্লোন ব্রান্ডো নয়তো ইনগ্রিড বার্গমান, সোফিয়া লোরেন, জেনিফার জোন্স, গ্রেস কেলি, মেরিলিন মনরো, অড্রে হেপবার্ম কিংবা লিজ টেলর! একেবারে নিরাশ হয়ে ফেরার ঘটনাতো ছিলই না বরং ছিল অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির সুখানুভূতি। নিউ এম্পায়ারে তখন শুধুসিনেমাই হত না, ছিল একটাদারুণ মঞ্চ। যে মঞ্চে প্রথম দেখেছি বহুরূপীর ছেঁড়াতার, উদয় শঙ্করের সূর্যনৃত্য, এবং সিনিয়ার পি. সি. সরকারের যাদু, প্রসঙ্গত বহুরূপীর মাধ্যমে গ্রুপ থিয়েটার তখন যেমন গড়ে উঠছে তেমনি তখন পেশাদারী রঙ্গালয়ও রমরমা। তখনও শ্রীরঙ্গমে এখন যার নাম বিশ্বরূপা অভিনয় করছেন শিশির ভাদুড়ি, পাশেই রঙমহল আর স্টার থিয়েটার। একটু দূরে বিডন স্ট্রীটে মিনার্ভা। যেখানে আস্তে আস্তে জাঁকিয়ে বসছেন তাঁর দল নিয়ে উৎপল দত্ত। তিতাস একটি নদীর নাম, অঙ্গার, কল্লোল, কিছুদিন পরেই একের পর এক দারণ দারুণ সব প্রযোজনা। আলোর যাদুকর তাপস সেন এসে গেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন অপরূপ সব আলোক বিপ্লব। যাতে পরম বিশ্বাসও হয়ে উঠছে কয়লা খনির খাদে বিধ্বংসি জলপ্রবাহ কিংবা বিশ্বরূপায় সেতু নাটকের ট্রেন চলে যাওয়ার দৃশ্য। মঞ্চ সাজাচ্ছেন খালেদ চৌধুরী।

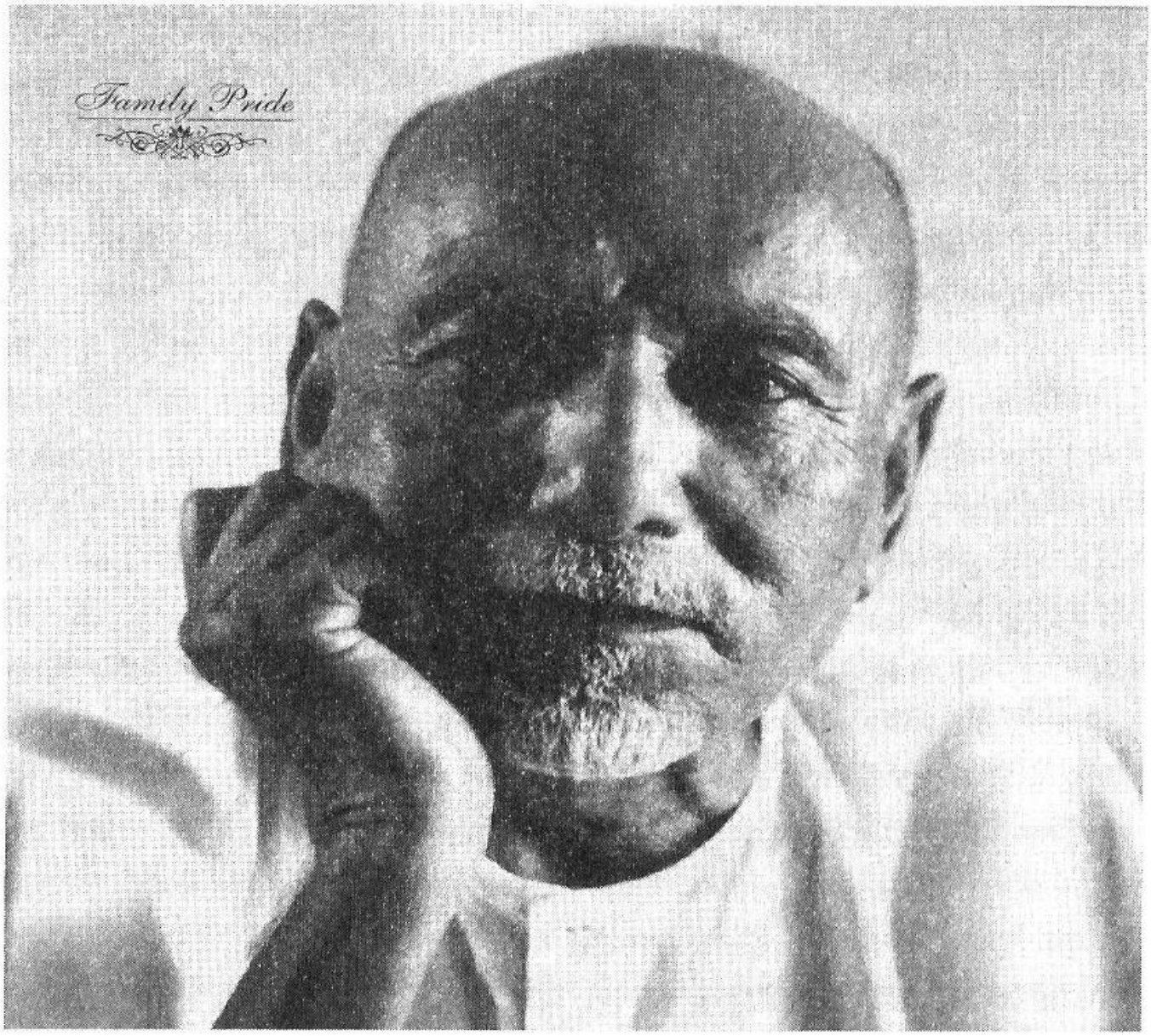

আলাউদ্দিন খাঁ ১৯৫৫ সালের এক দোলের রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষবার সরোদ ও সেতার, বেহালা বাজাতে এসেছিলেন

তখনকার শিব রাত্রির তিথিতে সব পেশাদারী রঙ্গমঞ্চেই অনুষ্ঠিত হত সারারাত ব্যাপী নাট্যাভিনয়। একটি নয়, তিন চারটি নাটক হত পরপর। সিনেমার অনেক অভিনেতাই তখন পেশাদারী মঞ্চে নাটক করছেন, যেমন করতেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, নীতিশ মুখার্জী। শ্যামলী নাটকে অভিনয় করেছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধায়। তাঁর অভিনয় জগতে পদার্পণই ঘটেছিল কান্তি গোষ্ঠীর নতুন ইহুদী নাটকে। নাট্যকার ছিলেন সলিল সেন। আর সহ অভিনেতা একেবারে অন্য রকম চরিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে আর ছিলেন প্রভাদেবী- সরযূ বালা, এক একটি চরিত্রকে যারা অমর করে গেছেন। নিষ্কৃতি নাটকে প্রভাদেবীর অভিনয় দেখেছিলাম বড়বৌ সিদ্ধেশ্বরীর ভূমিকায়। তখন তাঁর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। সন্ধ্যারানী করেছিলেন ছোটবউ, কিন্তু হাততালির সিংহভাগ পেয়েছিলেন প্রভাদেবীই। মলিনাদেবীও মঞ্চ

কাঁপিয়েছিলেন বিভিন্ন ভূমিকায়। একই শিব চতুর্দশীর রাত্রিতে নিষ্কৃতি ছাড়াও রঙমহলে দেখেছিলাম কেদার রায়। সেনাপতি কারভালোর ভূমিকায় ছিলেন ভূমেন রায়। তখনকার সব নাটকেই সাহেবদের বাংলার উচ্চারণে 'তুমি হত, টুমি।' এবং বাক্য গঠনও ছিল 'হামার জীবন ঠাকিতে টোমার মৃত্যু কেহ ঠেকাইতে পারিবে না' গোছের। তো পরম আগ্রহে কারভালোর চড়া সুরের অভিনয়ই দর্শকদের কাছে বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

পঞ্চাশের দশকে গণনাট্য গাঁয়ে গঞ্জেই শুধু নাটককে ছড়িয়ে দেয়নি, কলকাতায়ও শো হত। অনেক শক্তিমান অভিনেতা ও অভিনেত্রী ছিলেন তাদের মধ্যে। রাহুমুক্ত নাটকটি জনপ্রিয় হয়েছিল খুবই। মধ্য পঞ্চাশে দক্ষিণ কোলকাতার মুক্তাঙ্গন খুলল শৌভনিক নাট্যগোষ্ঠী। বাদল সরকার এসে গেছেন 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নিয়ে। তার আগে হৈহৈ করে মঞ্চস্থ হল 'পিরানদেল্লো', নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র। শেক্সপিয়ার বাদ দিলে তার আগে অন্যকোন বিদেশী নাট্যকার খুব সম্ভবত অনূদিত হয়নি মঞ্চে। প্রায় সমসময়ে এল বহুরূপীর প্রযোজনার ইব সেনের 'ডলস হাউস' থেকে পুতুল খেলা এবং 'এনিমি অফ দ্য পিউপিল' এর ভাষান্তরে মঞ্চায়ন 'দশচক্র'। এগুলি বাংলা নাটকে এক একটি মাইলস্টোন। যা নিয়ে মেতে উঠেছিল কলকাতা।

ততদিনে হেমন্ত কণ্ঠে গাঁয়ের বধূ নিয়ে চলে এসেছেন সলিল চৌধুরী। পরপর পালকির গান, রানার এবং অবাক পৃথিবী ছাড়াও গণনাট্যের কালজয়ী আরও কত গান। বাংলা গানের সেটা স্বর্ণযুগ। বলা যেতে পারে আকাশভরা সব নক্ষত্রের মেলা, তারায় তারায় দীপাবলী। পয়লা বৈশাখে বসুশ্রীর বিখ্যাত অনুষ্ঠান ছাড়াও পাড়ায় পাড়ায় জলসা। হেমন্ত, দ্বিজেন, শ্যামল, মানবেন্দ্র, তরুণ, ধনঞ্জয়, মৃণাল, দেবব্রত বিশ্বাস, সুবীর সেন, সন্ধ্যা, প্রতিমা, আলপনা, কনিকা, সুচিত্রা মিত্র, সুবিনয় রায়, সতীনাথ, উৎপলা সেন, পান্নালাল এবং আরো অন্যেরা। পাড়ার জলসা ছাড়াও বিভিন্ন কলেজে বা হোস্টেলে বার্ষিক একটা ফাংসান তো হতই - পঞ্চাশের দশকে যে গান শুনেছি তা সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে রয়েছে।

গীতিকার হিসেবে তখন গৌরিপ্রসন্ন ছাড়াও আরো কিছু অসামান্য কথা উপহার দিয়েছেন অন্যরা। সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলংকার, অথবা নীড় ছোট ক্ষতি নেই আকাশ তো বড় - এ রকম অসাধারণ কাব্যিক কিছু তথ্য অমর হয়ে থেকে গেছে। সুরকার হিসেবে সলিল তো যুগশ্রেষ্ঠ। সুধীন দাশগুপ্ত উপহার দিয়েছিলেন অনেক অন্যরকম অচেনা অথচ মনকাড়া মেলোডি। সেই দশকের ছেলেমেয়েদের গলায় গুনগুনানি থাকতো ঐসব প্রাণভোলানো সুরেই। তখন গানবাজনা কথাটায় গানটাই ছিল প্রধান। শুধু একজোড়া বাঁয়া তবলা আর গায়কের স্বহস্তে বাজানো হারমোনিয়ামটাই ছিল কাফি, তাতেই শ্রোতাদের আর একটার অনুরোধ ছিল রেকারিং ডেসিমেলের মত অন্তহীন। এখন সত্যিকারের গুণি দু এক জনকে বাদ দিলে আর

সবাই দশখানা হ্যান্ডস ছাড়া কণ্ঠ দিয়ে আওয়াজ বার করতে সাহস পান না। প্রচলিত সুরের প্যাটার্নটা দ্রুত পাল্টাতে থাকে -শুরু হয় নতুন এক্সপেরিমেন্ট।

একই কথা তখনকার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জগতেও। ৫০ সালে পুরবী সিনেমা হলে অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স হয়েছিল তিন রাত্রিব্যাপী। তখন একটা অতি চমৎকার ব্যবস্থা ছিল - উদ্যোক্তারা সঙ্গীত প্রেমী আম জনতার জন্যে হলের বাইরেও একটা লাউড স্পিকার রাখত যাতে যাদের টিকিট কাটার সংস্থান নেই তারাও সুরমধু আস্বাদন করতে পারেন। বিদ্যাসাগর হোস্টেলে প্রথম দিনই এক আবাসির পুরোনো ওস্তাদ বলে দিয়েছিল 'দেয়ার ইজ ওনলি ওয়ান রুল ইন বিদ্যাসাগর হোস্টেল, দ্যাট দেয়ার ইজ নো রুল।' কাজেই একটি মাদুর বগলে নিয়ে আমরা সারারাত শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে পরমানন্দে সঙ্গীত সুধা পান করেছিলাম। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে রাতবারোটা নাগাদ একে একে পাঁচ সাতজন শ্রোতা যারা স্টেটাস সিমবোলের জন্যই বেশীদামের টিকিট কেটে অনুরূপ অনুষ্ঠানে আসতেন, তারা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। আলোয়ানে মুখ ঢেকে হস্ত প্রসারিত করে তাদের কাছে আমরা টিকিট ভিক্ষে করেছিলাম এবং ভেতরের স্বর্গলোকে প্রবেশাধিকার নিয়েছিলাম। সেখানেই প্রথম শুনি যুবক রবিশঙ্কর এবং বিলায়েত খাঁ সাহেবের বাজনা। তখন তাদের দারুণ তৈরী হাত। দাপটের সঙ্গে বাজিয়েছিলেন দুজনেই। যদিও স্পর্ধিত আমার মনে হয়েছিল রসের ভাগে তখনও একটু ঘাটতি। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম যে দুজন জায়েন্ট আসছেন সঙ্গীত জগতে যারা ইতিহাসে থেকে যাবেন।

সেরাতেই সামানা সামনি শুনেছিলাম পণ্ডিত ওংকারনাথকে। তিনি মালকোশ গেয়েছিলেন। রেকর্ডে যে ওংকারনাথের নীলাম্বরি দেশকারগান শুনেছি প্যান্ট পড়তে শেখারও আগে সুদূর ছোটবেলায়। সঙ্গে সারেঙ্গির সংগত ছিল না, ছিলেন একজন বিরল কেশ বেহালা বাদক, তেমন সংগতি বেহালার কম্বিনেশন পরে আর শুনিনি। বিশাল চেহারা, মঞ্চ জুড়ে যেন বসেইছিলেন পণ্ডিতজি। এতটা অঙ্গভঙ্গি পরেও - আর করেছেন যেন সর্বাঙ্গ দিয়েই গাইছিলেন। নাভি থেকে এক একটি ঝলক তান ছাড়ছিলেন, দুটি হাত সেই তানের সঙ্গে কোমর থেকে ক্রমশ মাথার উপরে উঠে যাচ্ছিল। গলার স্বর অনায়াসে তারসপ্তকও প্রায় অতিক্রম করে যাচ্ছিল, দাপটও ছিল প্রচন্ড, কিন্তু যে রসের স্বাদ ছিল আলি আকবরের শরোদ, কিংবা বিলায়েত খাঁ সাহেবের সেতার কিংবা আমির খাঁ সাহেব বা বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের কণ্ঠে তার বদলে পান্ডিত্য রসায়নটাই যেন অনেক বেশী ছিল ঠাকুর সাহেবের গায়কিতে।

কী সব নক্ষত্রেরা দ্যুতিমান ছিলেন সেই পঞ্চাশের দশকে। গুরুর গুরু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব। যার কল্যাণে আমরা সেকালের ভাগ্যবানেরা পেয়েছিলাম সুযোগ্য পুত্র আলি আকবরকে। যার তুল্য সরোদিয়া ভারতে আর কেউ জন্মায়নি এবং ভবিষ্যতের

এই আকবরের এবং সাধনাহীনতার দিনে আর জন্মাবে বলেও মনে হয় না। সরোদের বাজে একটি গম্ভীর বিষণ্ণতা আছে কিন্তু সেই সরোদটাই যে কোন রাগ রাগীনির আসল রূপটি কখনও আকুতি কখনও বিরহের কান্না আবার কখনও বা নতুন বসন্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে এমন কল্লোলিত হয়ে উঠতে পারে শ্রোতাকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারে তার ক্ষুদ্র স্বকীয়তার গম্ভীর সীমা ছাড়িয়ে এক অনির্বচনীয় সুরলোকে যেখানে সুখ, দুঃখ বলে কোন বোধ থাকে না, থাকে শুধু এক অলৌকিক অনুভূতির প্রাপ্ত চেতনা—এ কেবল, দু একটি দুর্লভ আসরে কেবল তার বাজনাতেই পেয়ে ধন্য হয়েছি আমরা। আরও পেয়েছিলাম তিমির বরণ রবিশঙ্কর - পান্নালাল ঘোষের মত শিষ্যদের।

মনে আছে ৫৪ সালে ভারতী সিনেমা হলে এক সারারাত্রি ব্যাপী অনুষ্ঠান ছিল এবং এই আসরেও বাইরে মাইক ছিল। গভীর রাতে পাশের পেট্রোল পাম্পে খবরের কাগজ পেতে আমরা সুর কাঙালেরা বসেছিলাম। হীরা বাই বরোদকার গান গেয়েছিলেন। তারপরে এলেন ইমরাত খানের বাপকা বেটা বিলায়েত। প্রথমে বাজিয়েছিলেন ইমন, তারপর মধ্যযামিনীতে একটি পাহাড়ি ধুন এবং তারপর সেই প্রথম প্রকাশ্যে বাজালেন 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি' অনুসরণ করে বাউলের সুরে ধুনটি। রসের অভিঘাতে আমরা বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। মস্ত হয়ে গিয়েছিলেন সম্ভবত ওস্তাদ নিজেও, অনেকক্ষণ বাজালেন ফিরে ফিরে - বিশেষত 'ও বন্ধু আমার' অংশটি 'ন্ ধ্ প্' এই তিনটি মাত্র স্ট্রোকে যে কি অপূর্ব ব্যঞ্জনা এনেছিলেন। এক একদিন এমনই হয়ে থাকে। যে রাগ বহুদিন বাজিয়েছেন - হঠাৎ কোনদিন তার মধ্যেই নতুন নতুন বাঁক, নতুন নতুন মোড়, কোথা থেকে এসে যেন ধরা দেয়। সেদিনও বোধহয় তাই হয়েছিল। ভোর হয়ে আসছিল আমরাও রেশটুকু নিয়েই উঠে এসেছিলাম - এর পরের প্রোগ্রাম রবি শঙ্করজির থাকা সত্ত্বেও।

১৯৫৫ সালে এক দোলের রাত্রিতে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে আমরা একে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসিয়েছিলাম। মাইহার থেকে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে ধরে আনা হয়েছিল ত্রিগুণা সেনের নির্দেশে। সেই তার কলকাতার সম্ভবত শেষ বাজানো। শুধু সরোদ নয়, আমাদেরবিশেষ অনুরোধে বেহালাও বাজিয়েছিলেন একটু। সরোদে সঙ্গ দিয়েছিলেন নাতি অভিজিৎ, আর তবলায় এক ভারত বিখ্যাত তবলচি। আমার পরিচিত এক বয়স্কা মহিলা খাঁ সাহেবকে প্রণাম করতে গ্রিন রুমে এসেছিলেন, প্রণাম করে মুগ্ধ বিস্ময়ে জানালেন যে গুরু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের বাজনা সামনে বসে শোনার সাধ ছিল তার বহুদিনের। সেই সাধ এতদিনে মিটল। আরাম কেদারায় বসা বৃদ্ধ গুরুজি বললেন এইটা কি একটা বাজনা হইল, তবলায় তো যুদ্ধ করল মা দুগ্গার ঐ অসুরডা। বলে অঙ্গুলি নির্দেশে সেই ভারত খ্যাত তবলচিকে দেখালেন। তিনি

পাশে দুহাত জোড় করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। তখন ওস্তাদদের মধ্যে এই মান্যতাটা ছিল, অহংকার তখন সর্বগ্রাসী হয়নি।

সেই আসরেই প্রথম কোলকাতায় এসেছিলেন ভীমসেন যোশী, কালো শেরওয়ানি আর চোস্ত পাজামা পড়া। পন্ডিতজি চলে এসেছেন একেবারে খালিহাতে। তখন তিনি যুবক কোলকাতা - শুধু কোলকাতা কেন সারা ভারতই তখন তাকে তেমন ভাবে চেনে না। সঙ্গে এমনকি তার তানপুরাটিও নেই। স্কেলটা জেনে নিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে পন্ডিত চিন্ময় লাহিড়ির বাড়ি থেকেদুটি তানপুরা আনা হল। তারই দুই ছাত্রের মাধ্যমে এবং তারাই তানপুরা ছাড়লেন। ললিত গাইলেন ভীমসেন - শ্রোতারা মুগ্ধ। শ্রোতারা, মানে কনভকেশনের সেই বিশাল প্যান্ডেলে সেদিন একটি চেয়ারও খালি ছিল না। সবার কাছেই এ এক নতুন প্রতিভার প্রথম অভ্যুদয়ের বিস্ময় মেশানো আরম্ভের অভিজ্ঞতা। শেষ করলেন ভৈরবিতে। তাঁর সেই বিখ্যাত ভজন 'জো ভজে হরিকো সদা' দিয়ে এবং ভারতের সঙ্গীত জগতে আর একটি উজ্জ্বল প্রতিভা জ্বলে উঠলো।

যা বলছিলাম, তখনও হাফেজ আলি ছিলেন, পালুস্কার, বড়ে খাঁ সাহেবতো ছিলেনই, ছিলেন আমির খাঁ, খাস কলকাতাতেই ছিলেন তারাপদ চক্রবর্তী, চিন্ময় লাহিড়ী। হীরা বাই, কেশর বাই, বেগম আখতার, সরস্বতী বাই রানে - এরাও কলকাতা এসেছেন হামেসাই যদিও কেশর বাই একবারই শুনেছি গরচা রোডের এক জলসায়। সঙ্গে হারমোনিয়ামে ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, গেয়েছিলেন 'নন্দ' - তারার পঞ্চমে এসে গলা ধরে গেল হঠাৎ - গান থামিয়ে দিলেন জ্ঞানপ্রকাশের দিকেতাকিয়ে একটু হেঁসে বললেন, 'গলে কা কাজ দেখো। হাতির দাঁতের মত গায়ের রঙ, বয়স হয়েছে যথেষ্ট কিন্তু কি দাপটেই না গাইলেন। বাজনায় গানের তিন মহাজন ছাড়াও বেহালায় ভি. জি. যোগ সানাইয়ে বিসমিল্লা খাঁ সাহেব তারাও মাতিয়েছেন পঞ্চাশের দশক। ছিলেন বলরাম পাঠক, মুস্তাকআলি খাঁসাহেব দুজনেই সেতারি। তবলাতেও তখন কণ্ঠে মহারাজ, আনোখেলাল, মিশির, আল্লারাখা, শামতাপ্রসাদ আর সাথে সঙ্গেতে তুলনাহীন কেরাবত আলি। তার শিষ্য কানাই দত্ত। কত যে নাম বাদ গেল কে জানে - কত প্রতিভাই যে ছিল সে যুগে। তবে আর একজন ছিলেন সারেঙ্গির সাগেরুদ্দিন। ছোট্ট মানুষটি অনর্গল পান চিবোচ্ছেন। হাততো নয় যেন সুরের একটা যাদুদন্ড ছিল তার।

সাহিত্য জগতের কথা আর কি বলব! তখনকার এক একটি পুজো সংখ্যা মানেই বাংলা সাহিত্যের এক একটি শ্রেষ্ঠ" সংকলন। পূর্ণ মহিমায় বিরাজ করছেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি, মানিক, তারাশঙ্কর। আছে শরদিন্দু, নারায়ণ, প্রেমেন, বুদ্ধ, অচিন্ত্য, সতীনাথ, বিমল কর, বিমল মিত্র, বনফুল, প্রবোধ, রাজশেখর বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, মনজ বসু, প্রণাবি, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মুজতুবা আলি, জ্যোতিরিন্দ্র ও আরও কত অসামান্য লেখকেরা। পঞ্চাশের গোড়াতেই বেরিয়ে গেছে. টি. রোডের

ধারে উত্তরঙ্গ, শ্রীমতী কাফে - এক সুদীর্ঘ অন্যরকম কলম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন এক বলিষ্ঠ লেখক সমরেশ বসু। তখন যেন রীতিমত সাহিত্যের মহাভোজ। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, শরত বাদ দিলে বাংলা সাহিত্য সবচেয়ে পুষ্টি পেয়েছিলেন সেই পঞ্চাশের দিনগুলিতেই।

বাংলা সিনেমার বাণিজ্যিক ছবির তো কথাই নেই। তখন যে উত্তম সুচিত্রার যুগ, অজয় কর, তপন সিংহরা তখন একটার পর একটা সর্বজনপ্রিয় ছবি উপহার দিচ্ছেন বাংলা সিনেমার সর্বকালের সেরা পরিচালকেরাও তো এই দশকেরই ফসল। সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃনাল - যেন প্রতিভার জোয়ার এল বাংলার সংস্কৃতি সমুদ্রকে মন্থন করে। সারা পৃথিবী জানল বাংলা নামে ভাষাটিতে সিনেমা এক বিশ্বজনীন শিল্প মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

কমেডিয়ানদেরও যুগ ছিল সেটা। তুলসি, ভানু, জহর, নবদ্বীপ, শ্যাম লাহা - ভাঁড়ামি ছিল না - সত্যিকারের রসিকতা ছিল।

আর খেলাধুলোও যদি সংস্কৃতির একটি অঙ্গ হয় তবে একবার তখনকার ফুটবল মাঠে চলুন। এমনিতেই নামের তালিকার ভারে লেখাটি প্রায় গ্রন্থপঞ্জির মত হয়ে গেছে তাই আর নতুন ফিরিস্তি দেব না, তবে পঞ্চপান্ডব আর চুনী, পি. কে. বলরাম ছাড়াও আরও বহু শিল্পী ছিলেন মাঠে। এক দশকের মধ্যে যদি এত অসংখ্য কীর্তিমানরা ভিড় করে আসেন তখন নামাবলি জড়ানো ছাড়া ভাষ্যকারেরই বা কী উপায় থাকে।

পঞ্চাশের কিছুকিছু অমূল্য প্রতিষ্ঠান আর আজ নেই। দিনগুলিতো তার সোনার খাঁচা থেকে বেড়িয়ে এখন পাগলের মত উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেই। নবনব ভোগ বিলাস মেটাবার রক্তক্ষয়ী ইঁদুর দৌড়ে - যে উন্মাদ বাহু তখনও মানুষকে গ্রাস করেনি। বন্ধুত্ব ছিল সামাজিকতা ছিল, লোকে পরস্পরের কাছে যেত, এসো এসো করে দায় মেটাতো না, জীবন ছিল অনেক স্নিগ্ধ, তখন একে অপরকে আমরা চিঠি লিখতাম প্রেমিক প্রেমিকাকেই শুধু নয় বন্ধু ও বান্ধবীকেও এবং সে সব বড় সুন্দর যত্নের জিনিস ছিল। অনেক চিঠিই সাহিত্যের পদমর্যাদা পেতে পারতো। আর ছিল আড্ডা, বাঙালীর নির্ভেজাল, স্বার্থহীন আড্ডা। কোথাও কোথাও কর্মহীন বয়স্করা এখনও তা চালু রেখেছে বটে- কিন্তু তখন আমরা যৌবন কালেরও অনেক মধুর মুহূর্ত পেয়েছি সেই আড্ডাতেই। হায় আজকে যুবক যুবতিরা জানে না সত্যিকারের আড্ডা কাকে বলে!

কফি হাউস আছে বটে কিন্তু সেই প্রাণ আর নেই। আর নেই বসন্ত কেবিন, অমৃতায়ন, বসুশ্রীর দোতলায় বা পাড়ায় পাড়ায় সেই বিখ্যাত সাঙ্গুভ্যালীর রেস্তোরাগুলি যেখানে দুকাপ চা নিয়ে সারাদিন আড্ডা দেওয়া যেত। মানুষগুলি এখন ক্রমশ দ্রুত এক একটা নির্জন দ্বীপের মত হয়ে যাচ্ছে। তখনকার মত প্রেম কি আর বেঁচে আছে এই একুশে - মনে তো হয় না, সময় কোথায়।